Vol. 33 | No. 1 | 1989

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র চাঁদের অমাবস্যা

Volume	33
Issue	1
Year	1989
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	সৌদা আখতার
Published online	October 1, 1989
DOI	10.62328/sp.v33i1.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i1.4
Pages	92-115
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্-র চাঁদের অমাবস্যা

সৌদা আখতার

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ একদা কাজি আফসারউদ্দিন আহমদকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন "আমার দুয়েকটা গল্প দার্শনিক হলেও, আমি দার্শনিক নই"।[১] এভাবে তিনি নিজের সৃজনভুবনে দার্শনিক চিন্তার উদ্ভাস স্বীকার করেছেন। এ ছাড়া ফরাসী সাহিত্যে তাঁর আগ্রহ এবং নিষ্ঠা আজ আর পাঠকের অবিদিত নেই। এ থেকে অনুমান করা যায় যে সমকালীন পাশ্চাত্য দর্শনও তাঁকে প্রভাবিত করেছিল নিঃসন্দেহে। তাঁর রচনায় ফরাসী সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, পরিমিতি জ্ঞান, বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। জীবন সম্পর্কে তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী সাক্ষ্য দেয় যে সচেতনভাবে না হলেও তাঁর অলক্ষেই হয়ত সমকালের ফরাসী দর্শনচিন্তা শেষ দুটি উপন্যাসের অস্থি-সংস্থানে ছায়াপাত করে গেছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে একসময় স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও ফরাসী চিন্তাবিদ বার্গসঁ-র গতিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবে তত্ত্বদর্শন কখনোই সরাসরি যুক্তি তর্ক নিয়ে সাহিত্যে উপস্থিত হয়না। সাহিত্যে তত্ত্বীয় দর্শনের পরিবেশনা হয় ভিন্ন আধারে ভিন্নরকমভাবে। তাই বার্গসঁ-র গতিবাদ রবীন্দ্র-মানসের বিশিষ্টতায় জারিত হয়ে ভিন্ন আকৃতি নিয়েছিল। সেভাবে স্বসময়ের আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি প্রাগ্রসর দর্শনচিন্তা সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্কে কিভাবে কতটুকু অধিকার করে নিয়েছিল আজ তা সমালোচকের অনুসন্ধানের বিষয়।

পাশ্চাত্যের ক্যামু-সার্ত্রে-বেকেটর মত দর্শনতত্ত্ব কখনোই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র উপন্যাসে সরাসরি বিষয় হিসেবে আসেনি সত্য, কিন্তু আধুনিক পাঠক মাত্রই জানেন যে বাহ্যত তাঁর রচনাপরিমণ্ডল সর্বার্থেই রক্ষণশীলতা-মুক্ত, অতি উদার। বিশেষ করে তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'চাঁদের অমাবস্যার শিল্প-উপাদান অন্তর্গত চৈতন্যে ব্যাপকপ্রসারী। এ উপন্যাসের মূল চরিত্রে বহির্বাস্তবতা তার অন্তর্বাস্তবতার সঙ্গে একাকার হয়ে যে অদৃষ্ট-পূর্ব জগৎ

নির্মাণ করেছে সেখানে তিনি পাঠকের জন্য যে ম্যাসেজ দিয়েছেন তাকে অস্তিত্ববাদী দর্শনের আওতায় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। যদি বিশ্বাস করতে হয় যে লেখক সচেতনভাবে পাঠককে এই ম্যাসেজ দেবার কথা ভাবেননি, তাহলে বলতে হবে যে তাঁর মনন মানস এবং সমকালের অধ্যয়ন নিজের অলক্ষেই 'চাঁদের অমাবস্যার' আরেফ আলী চরিত্রে পদপাত করে গেছে। আজীবন প্রবাসে ছিলেন বলে বিচিত্র পাশ্চত্য শিল্পরীতি, তার ইতিহাস-দর্শন, বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদ, বিপ্লববাদ প্রভৃতির সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত মানস-সংযোগ তাঁকে করে তুলেছে অসাধারণ জীবনদৃষ্টিসম্পন্ন। তাঁর প্রথম উপন্যাসে প্রেক্ষিত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে বাঙালী মুসলমান সমাজের শোষণের মূল উৎস ধর্মান্ধতা। সজাগ অভিনিবেশ দিয়ে গ্রামীণ জনজীবনের এই বিকৃত বাস্তবতাকে তিনি পাঠকের চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বিষয় করেছেন। সমকালের সমাজ পারিপার্শ্বিকতাকে অত্যন্ত সাহসের সঙ্গে ছিন্ন ভিন্ন করে পাঠকের চৈতন্যকে করে তুলেছেন প্রশ্নসঙ্কুল।

প্রথম উপন্যাসটিতে কাহিনী-লোলুপ পাঠককে সমাজ প্রতিবেশের একটি বিশেষ বিচ্যুতির দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে তাদের মন তৈরী করার চেষ্টা করেন তিনি। সমকালের অন্য ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে এখানেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য চোখে পড়ার মত। 'লাল সালু'র মাধ্যমে যে পাঠক শ্রেণীর মন তিনি তৈরী করেছিলেন দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে তাদের জন্যই তিনি লিখলেন 'চাঁদের অমাবস্যা'। এক যুবতী নারীর অপঘাত মৃত্যুর মত একটি মাত্র ঘটনাকে ঘিরে মূল চরিত্রে মনোবাস্তবতার ব্যবহার এবং ধাপে ধাপে সুদৃঢ় যুক্তি চিন্তায় তার উত্তরণ এ উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য। ইরেজী সাহিত্যে Stream of consciousness পদ্ধতি জেমস জয়েস, ভার্জিনিয়া উলফ এবং ফকনারের প্রথম দিককার উপন্যাসে ব্যবহৃত হলেও প্রতিষ্ঠিত ধারা হিসেবে এই পদ্ধতির অনুস্থতি বড় একটা দেখা যায়না। তবে উপন্যাসের অন্যান্য উপাদানের অনুষঙ্গে এর ব্যবহার কখনো কখনো পরিলক্ষিত হয়। 'চাঁদের অমাবস্যা'তেও এই পদ্ধতি ব্যবহৃত। এই রচনা পদ্ধতিতে তিনি আরো একটি উপাদান যুক্ত করেছেন।

> মুসলমান লেখকদের মধ্যে তিনিই প্রথম বাংলা গল্প উপন্যাসে, আধুনিক দর্শনতত্ত্ব তথা 'অস্তিত্ববাদ' বিশ্বাসকে সার্থক উপমিতিতে মিশ্রিত করেছেন।[২]

তাঁর পঠন-পাঠন, মনন-মানস এবং অস্তিত্ববাদী দর্শনের পীঠস্থান প্যারিসে তাঁর অবস্থান, উপন্যাসে এই দর্শন-চিন্তার ব্যবহার অনেকটা নির্বাধ ও গভীর তলশায়ী করে তুলেছে। হয়ত লেখকের আশা ছিল যে এভাবে দর্শনচিন্তা সাহিত্যে এলে তিনি বাঙালী পাঠকের মানস ভুবনকে নব-স্রোতধারার তরঙ্গ-সংঘাতে ও জীবনের সঘন উপলব্ধির আস্বাদে করে তুলবেন আধুনিক শিল্প-চেতনাভোগী মানুষের আলো-আঁধারময় অতল-গভীর চৈতন্যে-অনুসন্ধিৎসু আলোকপাত করে পাঠককে অস্তিত্ববাদের মত অতি আধুনিক এক দর্শনতত্ত্বের রসাভিলাষী করে তোলার চেষ্টা ছিল তাঁর। তবে কার্যত তা হয়নি।

সে সময়কার অর্ধশিক্ষিত পাঠকসমাজ 'লালসালুর' প্রতিবাদী বক্তব্য যদি বা গ্রহণ করল 'চাঁদের অমাবস্যা'র মূল চরিত্রের অন্তর্দ্বন্দ্বের অতল-শায়ী গাম্ভীর্যকে হজম করার জারক তারা খুঁজে পেলনা। কারণ তাঁর প্রথম উপন্যাস থেকে দ্বিতীয় উপন্যাসের দূরত্ব চৌদ্দ বছরের। এই দীর্ঘ বিলম্বের অবসরে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করে নিয়েছেন আবু রুশদ, সরদার জয়েনউদ্দিন, রশীদ করিম, শওকত ওসমান, শামসুদ্দিন আবুল কালাম প্রমুখ লেখকেরা। এঁরা মূলত কাহিনী নির্ভর, সরল রৈখিক ও প্রথাগত উপন্যাস নির্মাণে সিদ্ধহস্ত। ফলে তাঁর রচনায় পাশ্চাত্য দর্শন-চেতনা শিল্প সফলভাবে উপস্থিত হয়ে বাংলা উপন্যাসকে পশ্চিমের শিল্প-রীতির সমান্তরাল হবার গৌরব দিতে পারলেও সমকালের পাঠক তা গ্রহণে অপারগ প্রমাণিত হয়। এ উপন্যাসের শিল্প প্রকরণে বিশ্ব-শিল্প-ঐতিহ্য এবং উপাদানে এক অবিনাশী তত্ত্ব দর্শনের ছায়াসম্পাত আজকের পাঠক লক্ষ্য করলেও সমকালে তা পর্যাপ্ত পাঠক সমালোচকের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। এর কারণ হিসেবে সৈয়দ আবুল মকসুদের বক্তব্য —

> বাংলা ভাষার আর কোন উপন্যাসের সঙ্গে এর ঘটনা ও ঘটনা সংস্থানের, বিষয় ও প্রকরণের মিল খুঁজে না পেয়েই এর প্রতি গুরুত্বারোপ করা থেকে বিরত থাকেন সমালোচকরা।[৩]

আসলে শুধু ঘটনা এবং প্রকরণের প্রচ্ছায়া অন্যত্র পাওয়া যায়নি বলে নয়, অন্যান্য কারণেও এদেশের পাঠক-সমালোচক উপন্যাসটিকে তার যথার্থ মূল্যে গ্রহণ করতে অসমর্থ হন। আর তা হোল অস্তিত্ববাদী দর্শন ও তার প্রবক্তা সম্পর্কে পাঠক সমালোচকের অনাগ্রহ। এবং প্রচলিত শৈলী-বিচ্যুত কোন সাহিত্যপ্রয়াস গ্রহণে সমালোচকের অনুদার কুণ্ঠা।

অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান প্রবক্তা জ্যাঁ-পল সার্ত্র এবং তাঁর দর্শন-তত্ত্ব সম্পর্কে এই চিন্তাবিদের জীবৎকালে আমাদের দেশের পাঠক-সমালোচক বিশেষ উৎসাহী ছিলেন বলে মনে হয়না। এই প্রাগ্রসর দর্শনচিন্তা পাশ্চাত্যের চিন্তাজগতে আলোড়ন তুললেও এদেশে সার্ত্র চর্চা শুরু হয় এই মহান চিন্তা নায়কের মৃত্যুর পর উনিশ শ' আশি সালে——

> অস্তিত্ববাদী দার্শনিক চিন্তাধারার সর্বাধিক পরিচিত ব্যক্তিত্ব, ফরাসী দার্শনিক জ্যাঁ-পল সার্তের (১৯০৫-৮০) জীবনাবসানকে কেন্দ্র করে গত এপ্রিল মাসে বাংলাদেশের সংবাদপত্রে যে সব বক্তব্য ছাপা হয়েছে তার ভিত্তিতে এদেশের পাঠক সম্প্রদায় প্রথম বারের মত এত ব্যাপকভাবে জ্যাঁ-পল সার্ত এবং সার্ত এবং অস্তিত্ববাদ সম্পর্কে সামান্য কিছু হলেও জেনেছে।[৪]

যেহেতু ইতিপূর্বে সার্ত্রের নাম ক্লাশরুমের বাইরে খুব একটা শোনা যায়নি এবং যে পাঠক সমালোচক সার্ত্রের এই দর্শনের সঙ্গে সামান্যতম ভাবেও সংযুক্ত নন তাদের পক্ষে সৈয়দ ওয়ালীউল্লহ্‌র 'চাঁদের অমবস্যা' উপন্যাসটির যথার্থ মূল্যায়নও সম্ভব নয়। এমতাবস্থায় দার্শনিক প্রজ্ঞার অধিকারহীন এক সমালোচকের অসতর্ক মন্তব্য সৈয়দ আবুল মকসুদকে আহত করেছে——

> সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ যদি সত্যই জানতেন যে তাঁর "চাঁদের অমাবস্যা" সমালোচকের রসনায় ডিটেকটিভ উপন্যাসের স্বাদ পৌঁছে দেবে তাহলে হয়ত তাঁর পাণ্ডুলিপি প্যারিস থেকে সযত্নে পার্শেল করে প্রকাশকের কাছে না পাঠিয়ে হয় পুড়িয়ে ফেলতেন অথবা আটলান্টিকে ছুঁড়ে ফেলে দিতেন।[৫]

আমাদের সৌভাগ্য যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ দুটোর একটাও করেননি।

জাঁপল সার্ত্রের মৃত্যুর পর তাঁর দর্শনতত্ত্ব এবং সাহিত্যে তার প্রয়োগ নিয়ে এদেশের শিক্ষিত সমাজ লেখালেখি শুরু করার বহু পূর্বে লেখকের বিভূঁয়ে বাস করার দৌলতে 'চাঁদের অমাবস্যা'য় এই তত্ত্বচিন্তার প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ১৯৬৪ সালে। উপন্যাসটির ঘটনা সংস্থান এবং চরিত্রের বাস্তবতা বিশ্লেষণের ফাঁকে ফাঁকে দর্শন-চিন্তার ছায়পাত আসলে

পাঠক-সমালোচকের সঙ্গে লেখকের মানস-ব্যবধানকেই চিহ্নিত করে। ১৯৬৪ সালে যখন এ উপন্যাস রচিত হয় সে বছর সার্ত্রে নোবেল পুরস্কার প্রত্যাখ্যান করে পশ্চিমা বিশ্বে হৈ চৈ ফেলে দিয়েছেন। সে বছরই সার্ত্রের আত্মজীবনীমূলক রচনা দ্য ওয়ার্ডস প্রকাশিত হয়। ১৯৫০ সালের পরবর্তী সময়ে সার্ত্রকে দুটি চিন্তা দ্বারা নিরবচ্ছিন্নভাবে আক্রান্ত থাকতে দেখা যায়। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব নিয়ে তাঁর প্রথম চিন্তাকে রূপায়িত হতে দেখা যায় বিভিন্ন দার্শনিক ও রাজনৈতিক প্রবন্ধে এবং বিশ্বশান্তি বিষয়ে তাঁর চিন্তা-চেতনা স্থান পেয়েছে উপন্যাসে ও নাটকে। সার্ত্র তাঁর সাহিত্যে যে দার্শনিক চিন্তাকে ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করেছেন তা বহুকাল পূর্ব থেকেই দর্শনের জগতে সুপরিচিত। অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে ডেনমার্কের দার্শনিক কিয়েরকে গার্ড (১৮১৩-১৮৫৫) -এর নাম করা হয়ে থাকে। তবে তাঁর সমকালে এই চিন্তা ডেনমার্কের বাইরে বিশেষ প্রসার লাভ করেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের আগে ও পরে সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী সমাজ জীবনে যে বিপর্যয় দেখা দেয় তাতে সাধারণ মানুষ তার জীবনের নিশ্চিতি ও নিরাপত্তা নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত ও বিশ্বাসহারা হয়ে পড়ে। জীবনের এই দুঃখকাতর হতাশাময় চিত্রাবলী কবিতায় গল্পে রূপায়িত হতে থাকে। বিড়ম্বিত বেদনাময় জীবনের এই সাহিত্যিক-প্রকাশ একটি দার্শনিক চিন্তার উৎস থেকে উদ্ভূত বলে চিন্তাবিদ ও দার্শনিকেরা ধারণা করেন। এর উৎসে কিয়েরকে গার্ডের দর্শন চিন্তার সুদৃঢ়-ভিত্তি প্রমাণিত হয়। ফলে তিনি অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রতিষ্ঠাতার মর্যাদা পান। জাঁ-পল সার্ত্র এই দর্শনকে তাঁর বিশাল দার্শনিক ও সাহিত্যিক সৃজনভুবনের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীব্যাপী পরিচিত করে তুললেন। এ ভাবে যে দর্শন ছিল একাকী ডেনমার্কের, তা হয়ে উঠল সব মানুষের।

অস্তিত্ববাদী দর্শন অন্যান্য প্রচলিত দর্শন চিন্তার মত কোন সুপরিকল্পিত শৃঙ্খলা ও যুক্তিবন্ধনের পরম্পরার উপর স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে নেই। এই দর্শন সমগ্র পৃথিবীর যুক্তি-চিন্তায় বিতর্কের ঘূর্ণিঝড় তুললেও এর বক্তব্যবিষয়কে সুন্দরভাবে গুছিয়ে বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। তবু মোটামুটি ভাবে এ সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা দেবার চেষ্টা করা যেতে পারে। ইতিপূর্বে ঈশ্বর বিশ্বাসী যুক্তিবাদী দার্শনিকরা বিশ্বাস করতেন যে মানুষ জন্মমুহূর্তে ঈশ্বরের কাছ থেকে একটি সারধর্ম (essence) লাভ করে যা তার ভবিষ্যৎ জীবন

গড়ে তোলার জন্য দায়ী। অন্য অর্থে একজন মানুষ কি হবে না হবে কি কি করবে না করবে তা এই ঈশ্বর প্রদত্ত সারধর্মই নির্ধারণ করে দেয়। অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা এই বক্তব্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বলেন যে মানুষ নিজের জীবনের বিভিন্ন অভিজ্ঞতা ও ক্রিয়াকাণ্ডের মধ্য দিয়ে তার সারধর্ম গড়ে তোলে, ঈশ্বরের কাছ থেকে নিয়ে আসেনা। তাঁদের মতে মানুষ জন্মের সময় বড়জোর তার নিজস্ব বংশগতি বা এর কোন বিশেষ প্রবণতা তার 'জিন'-এর মধ্যে বহন করতে পারে। কিন্তু ভবিষ্যতে সে কি হবে বা হবেনা কি করবে বা করবেনা তা এই 'জিন'-কখনো নিশ্চিতভাবে নির্ধারণ করতে পারেনা। যদি মেনে নেয়া যায় যে মানুষ জন্মের সময় ঈশ্বরের কাছ থেকে 'সারধর্ম' নিয়ে এসেছে, যে সারধর্ম সে ভবিষ্যতে কি হবে না হবে তা নির্ধারণ করে দেবে, তা হলে বলতে হয় যে মানুষের কোন স্বাধীনতা নেই। অর্থাৎ তখন স্বাধীনতার অনুপস্থিতিতে মানুষ ইতর প্রাণীর মত সহজাত ও জন্মগত প্রবণতা দ্বারা পরিচালিত হবে। তার ভবিষ্যত হবে পূর্ব-নির্ধারিত। কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা মানুষের স্বাধীনতায় পূর্ণ আস্থাবান।

অস্তিত্ববাদীরা স্বাধীনতার স্বপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে বলেন যে মানুষ তার অভিজ্ঞতার সাহায্যে যে কোন সংকটময় মুহূর্তে বুঝতে পারে যে তার নির্বাচন (to choose) করার স্বাধীনতা আছে। এই নির্বাচনের সাহায্যে সে ভালোও হতে পারে মন্দও হতে পারে। নির্বাচনের এই স্বাধীনতাকে ব্যবহার করে মানুষ নিজের বিবিধ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে আপনার সারধর্ম গড়ে তোলে। পূর্ববর্তী এবং ঈশ্বর বিশ্বাসী যুক্তিবাদী দার্শনিকরা বলেন যে Essence precedes Existence or Essence determines Existence. কিন্তু অস্তিত্ববাদীরা বলেন Existence precedes essence or existence determines essence. দ্বিতীয় বক্তব্যটি জাঁ-পল সার্ত্রের একটি বহুকথিত প্রসিদ্ধ উক্তি।

এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে খুব সাধারণ ভাষায় সার্ত্রে বলেন—

> Man first of all exists, encounters himself, surges up in the world—and defines himself after words.... He will not be anything untill latter and then he will be what he makes himself.[৬]

তার অর্থ দাঁড়ায় এই যে——

> There is no essential human native, given in advance. Men are stuck down in the world, and they become whatever they choose to become by doing and feeling what they choose to do and feel.[৭]

সার্ত্রে এই বিষয়টিকে তাঁর বিখ্যাত Paper-Knife নির্মাণের যুক্তি-তর্কের সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

অস্তিত্ববাদীরা আসলে মানুষের নির্বাচনের (to choose) স্বাধীনতা— যা তার স্বাধীন অস্তিত্বের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী সংযুক্ত—তার উপরেই জোর দিয়েছেন বেশী। বিশেষ করে ব্যক্তিমানুষের একক স্বতন্ত্র অস্তিত্বেই তাঁদের অনুসন্ধিৎসা। ব্যক্তিমানুষ যখন সমাজে বিচরণ করে তখন সে সামাজিক বিধি-নিষেধের নিগড়ে পরাধীন সামাজিক জীব মাত্র। কিন্তু কোন নিঃসঙ্গ মুহূর্তে মানুষ যখন নিজের মুখোমুখি হয় তখন সে নিজের স্বতন্ত্র এবং একক অস্তিত্বের স্বরূপ অনুভব করে। ব্যক্তিমানুষ সমাজে জন্মগ্রহণ করেও সমাজ-বিবিক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করার মধ্যে দিয়ে স্বাধীনতার স্বাদ গ্রহণ করে। এভাবে চিন্তা করলে একজন ব্যক্তির দু'ধরনের অবস্থানের কথা জানা যায়। প্রথমটি গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত এবং অন্যটি একান্তই ব্যক্তিগত। একজন মানুষ প্রত্যহই সামাজিক জীবন যাপন করে। সামাজিক বা গোষ্ঠীজীবনের অর্থবহতা একমাত্র গোষ্ঠীতেই নিবদ্ধ। কারণ——

> A collective society is one in which the existence and life of the individual are determined by the existence and institutions of the group...এবং তার যাবতীয় কাজকর্ম ও নিজস্ব অস্তিত্ব সম্পর্কে বলা যায় যে—...He affirms himself through the group in which he participates...[৮]

অর্থাৎ প্রত্যহ সে এমন কতগুলি কর্ম সম্পাদন করে যে-গুলো তার মত আরো দশজন করে থাকে। এ জাতীয় কাজগুলো জীবনের নিত্যকর্মের অন্তর্গত বিধায় এর মধ্যে মানুষ তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে অনুভবের অবকাশ পায়না। দৈনন্দিন জীবনের রুটিন বাঁধা কাজের বাস্তবজগৎ মানুষকে জড়িয়ে থাকে পাকে পাকে। তাই এখানে মানুষের অন্য পরিচয় গোষ্ঠীমানুষ হিসেবে।

কিন্তু এই গোষ্ঠীমানুষ যখন জীবন চলার পথে কোন দুর্লঙ্ঘ্য সংকটের সম্মুখীন হয় তখনই একমাত্র সে তার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। সংকটে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব প্রবল হয়ে ধরা দেয়। সহজ জীবনাচরণে তা থাকে সংগুপ্ত।

গোষ্ঠীবদ্ধ সামাজিক জীবনই যে একজন ব্যক্তির সার্বিক পরিচয় নয় এই বিষয়টি একমাত্র সংকটের মুহূর্তেই যেমন অপরের কাছে, তেমনি ব্যক্তির নিজের কাছেও ধরা পড়ে। অবশ্য এই সংকটময় অবস্থা ব্যক্তির জীবনে প্রতিদিন আসেনা। কিন্তু যখন সংকটে সিদ্ধান্ত নিতে হয় তখন মানুষ সহসাই ব্যক্তি মানুষ হিসেবে নিজের মৌলিক অস্তিত্বকে উপলব্ধি করে। সে যে একজন মানুষ, গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র একক ব্যক্তিমানুষ, এই সত্যানুভব তার কাছে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। মানুষের এই অস্তিত্ব সম্পর্কে সার্ত্রের নিজস্ব ভাবনা তাঁর Nausea নামের উপন্যাসে এ-ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে —

> Usually existence hides itself. It is there, around us, in us, it is us, you can not say a couple of words without speaking of it, but finally you can't touch it, when I believed I was thinking about it, I suppose that I was thinking nothing, my head was empty... If anybody had asked me what existence was, I should have replied in good faith that it was nothing, just an empty form which added itself to external things, without changing anything in their nature. And then, all of a sudden there it was as clear as day : existence had suddenly unvaieled itself.[৯]

এই উদ্ধৃতি থেকে মনে হতে পারে যে অস্তিত্ববাদীরা সম্ভবত আবেগ-অনুভূতির বেদীতে অস্তিত্বের উপলব্ধিকে স্থাপন করে রেখেছেন। আসলে তা নয়। মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে হয়ত স্পর্শ করা যায়না কিন্তু তা একটি অনুভবের সৃষ্টি করে। দার্শনিকের যুক্তি দিয়ে জীবনকে পুরোপুরি ব্যাখ্যা করা যায়না। কারণ মানুষের জীবনে কিছু কিছু অভিজ্ঞতা আছে যেগুলি যুক্তিগ্রাহ্য নয়। অথচ এসব যুক্তিহীন অভিজ্ঞতাকে বাদ দিলে একজন

মানুষের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সম্পর্কে পুরো অভিজ্ঞান জন্মায়না। মানুষের জীবন যুক্তিগ্রাহ্য ও যুক্তিহীন, এই উভয়বিধ অভিজ্ঞতার সামগ্রিক রূপায়ণ। অস্তিত্ববাদী দর্শনে তাই ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি অভিজ্ঞতাকেই মূল্যবান মনে করা হয়। অর্থাৎ প্রত্যেক অভিজ্ঞতার উপাদানের সমন্বয়ে যে ব্যক্তিজীবন গড়ে ওঠে তার সামগ্রিক বা পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ নিয়েই অস্তিত্ববাদী চিন্তাবিদদের জগৎ।

সার্ত্রের পূর্বে কিয়েরকে গার্ড অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেছেন—

(১) ব্যক্তির অস্তিত্ব এমন যুক্তি যার দ্যোতক নয়, কারণ যুক্তি অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বিভিন্ন মানুষের সাদৃশ্য তুলে ধরে।
(২) অস্তিত্ব আবেগের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে।
(৩) অস্তিত্ব সিদ্ধান্ত নেয়া, কর্মপন্থা বাছাই এবং তার সঙ্গে জড়িত উদ্বেগ অনিশ্চয়তার মাধ্যমে উপলব্ধি করা যায়।
(৪) কর্মপন্থা স্বাধীন নির্বাচন, তাই অস্তিত্বের সঙ্গে স্বাধীনতা গভীরভাবে যুক্ত।[১০]

কিয়েরকে গার্ডের মত সার্ত্রেও বলেন যে কর্মপন্থা নির্বাচনের স্বাধীনতা অনুভবের মধ্যেই মানুষের অস্তিত্বের অবস্থান, স্বাধীনতা উপলব্ধির মধ্যেই মানুষ বুঝতে পারে যে তার জীবন সম্ভাবনা ও উদ্দেশ্যের আলোকদীপ্ত। মানুষের এই স্বাধীনতাকে যুক্তির সাহায্যে ব্যাখ্যা করা দুঃসাধ্য। কারণ এক-জন মানুষের সমগ্র জীবনব্যাপী কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে তার অধিকাংশ কর্মের কোন যুক্তি নাই। হয়ত কোন একটা কাজ সে ঠিকভাবে করে কিন্তু আরেকটা করেনা। কিন্তু কেন করেনা এর কোন যুক্তিসহ ব্যাখ্যা সম্ভব নয়। ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীন সত্তা, নিজের যুক্তিহীন কর্মকাণ্ডের জন্য বিরক্তি, প্রাত্যহিক জীবনে চারপাশের পৃথিবী প্রতিপদে যেভাবে বাধাদান করে তার প্রতি ক্রোধ, স্বাধীনতাসহ পৃথিবীতে সে পরিত্যক্ত এই বোধ থেকে জাত অসহায় রিক্ততার উপলব্ধি এবং সর্বোপরি গৃহীত সিদ্ধান্তের সাফল্যের বিষয়ে অনিশ্চয়তার অনুভূতি—এইসব উপাদানের সমন্বয়ে যে ব্যক্তিগত অস্তিত্ব গড়ে ওঠে সাধারণভাবে তাই সার্ত্রের ব্যক্তি-অস্তিত্ব।

অবশ্য এই দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা কিয়েরকে গার্ডের মতে একমাত্র ব্যক্তির কর্মজীবনের মধ্যেই ব্যক্তির অস্তিত্বের পূর্ণ পরিচয় পাওয়া যায়। মানবজীবন

বিচিত্র অভিজ্ঞতার সমষ্টি এবং এই অভিজ্ঞতা ব্যক্তির কর্মের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ব্যক্তি যখন কোন সংকটের মুখোমুখি হয়ে নিজস্ব কর্মপন্থা নির্ধারণ করে তখন সম্পাদনের উপায় হিসেবে সে তার সামনে অনেক পদ্ধতি দেখতে পায়। এর মধ্যে কোন পদ্ধতির সাফল্য সম্ভাবনা সর্বাধিক তা নিয়ে তার মধ্যে উদ্বেগ ও দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। এই উদ্বেগময় দ্বন্দ্বের মধ্যেই ব্যক্তির অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। সংকটময় পরিস্থিতিতে ব্যক্তি কর্মপন্থা নির্ধারণ ও তা সম্পাদনের পদ্ধতির ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতার সমস্ত উপাদান অর্থাৎ অনুভূতি কল্পনা চিন্তা প্রযত্ন প্রভৃতিকে একত্রে ব্যবহার করে বলেই ব্যক্তি –অস্তিত্বের সামগ্রিক অনুভূতি সম্ভব হয়। অর্থাৎ কিয়েরকে গার্ডের দর্শনে ব্যক্তির অস্তিত্ব উদ্বেগ অস্থিরতার সঙ্গে বেশী সম্পৃক্ত। এ ব্যাপারে সার্ত্রের মতামতও প্রায় একই। তবে তিনি উদ্বেগের অনুভূতিকে স্বাধীনতার অভিজ্ঞতার অন্তর্গত বলে মন্তব্য করেছেন।

সার্ত্রে মানুষের স্বাধীনতার ব্যাপারে কোন নিয়ন্ত্রণ স্বীকার করেন না। তাঁর মতে মানুষের অতীত তাকে নিয়ন্ত্রণ করেনা। মানব তার ভবিষ্যত গড়ে তোলে স্বেচ্ছায়। এই ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার জন্য মানুষ পুরোপুরিভাবে তার স্বাধীনতার উপর নির্ভর করে। অন্য অর্থে এই স্বাধীনতাই তার অস্তিত্ব। পছন্দ হোক বা না হোক এই বস্তুময় বিশ্বে মানুষ স্বাধীন—

> "Man is free, Man is freedom.... we are left alone, without excuse. That is what I mean when I say man is condemned to be free. Condemned because he did not creat himself, yet is nevertheless at libertry, and from the moment that he is thrown into this world he is responsible for everything he does.[১১]

মানুষের স্বাধীনতা এই দায়িত্বের জন্যই তার কাছে condemnent বলে মনে হয়। কারণ এ-দায়িত্ব শুধু তার একার জন্য নয়। জীবনের যে কোন সংকটে একজন মানুষ—

> must chose and in each choise I make I stand for mankind and this is a heavy burden.[১২]

এ-দায়িত্ব কেউ কাউকে দেয়না এ হচ্ছে ব্যক্তির নিজস্ব অনুভূতি। পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষ পরিত্যক্ত এবং একা। অথচ collective জীবনে অন্য মানুষের জন্য কল্যাণময় কিছু করা প্রতিটি ব্যক্তি মানুষের দায়িত্ব।

> This involves responslbility .... even for the wars that happen in my time.[১৩]

পৃথিবীর যে কোণাতেই মানুষ থাকুক না কেন প্রতিটি মানুষেরই যুদ্ধের মত ঘটনার জন্যও দায়িত্ব আছে, এটাই সার্ত্রের বক্তব্য। কারণ যে সিদ্ধান্তই নেয়া হোকনা কেন তা সমগ্র মানবজাতির হয়েই নেয়া হয়। তার কল্যাণের জন্যই নেয়া হয়।

সাধারণভাবে ব্যক্তির অস্তিত্ব তার স্বাধীনতা ও দায়িত্ব, যন্ত্রণা ও উদ্বেগ ইত্যাদির অনুষঙ্গে প্রকাশিত। এই দর্শনের প্রতিটি খুঁটিনাটিতে গিয়ে তার দীর্ঘ বিতর্কে প্রবেশ না করে সাহিত্যবিচারের প্রয়োজনে অস্তিত্ববাদের এই পরিচয়ই মোটামুটি ভাবে যথেষ্ট মনে হয়। সমালোচক Mary warnock -এর মতে সার্ত্রের সাহিত্যকর্ম ব্যাখ্যাতার জন্য অস্তিত্ববাদী দর্শন সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন বটে, কিন্তু

> A detailed, sentence-by-sentence analysis of any one of Sartre's philosophical writing would come to no good. .... The often attempts three or four ways of conveying a certain impression, which do not necessarily say exactly the same as and many even contradict each other.[১৪]

যেখানে সার্ত্রের দার্শনিক চিন্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসরণের মধ্য দিয়ে তাঁর সাহিত্যকর্মকে যথার্থ সন্তুষ্টির সঙ্গে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে সেই দর্শনের আলোকে ফ্রান্স-প্রবাসী বাঙালীর উপন্যাস আলোচনার চিন্তা আরো সুদূর পরাহত হবার কথা। কিন্তু এর পরেরও সমস্যা থাকে। এটা অনুমান যে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ সার্ত্রের দর্শনচিন্তার সঙ্গে পরিচিতি ছিলেন। থাকাটা খুবই সম্ভব। যেভাবে সেই চিন্তার একটা পরোক্ষ প্রভাব তাঁর উপন্যাসে আছে এটাও সম্ভব। এই প্রবন্ধের সূচনায় সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্র একটি স্বীকারোক্তি এবং সমালোচকের ভাবনায় অস্তিত্ববাদী দর্শন ও সৈয়দ

ওয়ালিউল্লাহ্‌র নাম একত্রে উচ্চারণ—এই দ্বিবিধ কারণে বর্তমান প্রবন্ধ লেখক এ ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সত্যিকার অর্থে অস্তিত্ববাদী দর্শনকে পরিষ্কারভাবে বোঝা বা বোঝানো একরকম দুঃসাধ্য বলে মনে হয়েছে। অস্তিত্ববাদীরা কখনোই দলবদ্ধভাবে কোন School-এর অন্তর্ভুক্ত নন। তাদের সবাই অস্তিত্ববাদের বিভিন্ন দিক নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন বক্তব্য দিয়েছেন। এ কারণে সর্বসম্মত কোন ধারণা এ বিষয়ে করা কষ্টকর। তবে একটা বিষয়ে তারা একমত যে অস্তিত্ববাদ কোন দার্শনিক মতবাদের সমষ্টি নয়। এ হচ্ছে জীবনবিচারের একটি প্রক্রিয়া বা পন্থা মাত্র। যে-পন্থার ভিন্ন ভিন্ন রূপায়ণ পাশ্চাত্যের সার্ত্রে-কাম্যু-কাফ্‌কার রচনায় পাওয়া যায়। বাংলা সাহিত্যে কাউকেই সেভাবে অস্তিত্ববাদী লেখক হিসেবে স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করা যায়না। কারণ সচেতনভাবে কেউই এই বিশেষ দার্শনিক তত্ত্বকে অবলম্বন করে সরাসরি কোন উপন্যাস রচনা করেননি। তবে কারুর রচনায় হয়তবা লেখকের অলক্ষ্যেই এই চিন্তার প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। সেভাবে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র রচনাকে বিশেষ করে তাঁর 'চাঁদের অমাবস্যা'—নামের উপন্যাসটিকে এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারের অবকাশ আছে বলেই মনে হয়েছে।

'চাঁদের অমাবস্যা' সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর দ্বিতীয় উপন্যাস। তাঁর প্রথম উপন্যাস ''লালসালু' রচনার উদ্দেশ্য ছিল এদেশের কুসংস্কার-লাঞ্ছিত ধর্মভীরু গ্রাম্যসমাজের মৌল সমস্যাটিকে তুলে ধরা। কলকাতায় বসে লেখা শুরু করলেও 'লাল সালু' লেখা শেষ হয় ঢাকায় এবং প্রকাশিত হয় ১৯৪৯ সালে। ১৯৬২ তে প্রকাশিত হয় 'চাঁদের অমাবস্যা' এবং ১৯৬৭ সালে 'লালসালুর' একটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশিত হয়। অবশ্য পরিমার্জনা ও পরিবর্ধনার কাজটি করেন স্বয়ং লেখক। অপরিণত বয়সের 'লালসালু' ইংরেজী অনুবাদে লেখকের অধিক বয়সের অভিজ্ঞতায় স্নাত হয়ে ভিন্নরূপ ধারণ করে—

> ভাষান্তরিত করার সময় অনুবাদিকা সার্ত্রে-অনুরাগী অ্যান-মারি এবং মূল লেখক উভয়েই সচেতনভাবে অস্তিত্ববাদী দর্শনের শক্ত তক্তার ওপর লালসালুকে স্থাপন করেন।[১৫]

এ-থেকেই অনুমান করা যায় যে অস্তিত্ববাদী চিন্তা চেতনায় ঋদ্ধ লেখকের মনীষা 'চাঁদের অমাবস্যা'য় পরিস্ফুট অবয়ব নিয়ে উপস্থিত থাকা সম্ভব।

"চাঁদের অমাবস্যা'র গল্প পরিসর অত্যন্ত স্বল্পায়তন। দরিদ্র এ দেশের প্রত্যন্ত গ্রামে নারী হত্যার মত একটি মেনে নেয়া ঘটনায় এক নিঃসম্পর্কীয় যুবকের নিঃসঙ্গ নির্যাতনের অভিযাত্রা এর কাহিনী। ছোট অখ্যাত এক গ্রামের যুবক শিক্ষক আরেফ আলী। জ্যোৎস্নালোকিত রাতে বাঁশ ঝাড়ে সে এক যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখতে পায়। ঘাতক এক সময় তার কাছে কৃতকর্ম স্বীকার করে। তখন বাধ্য হয়ে যুবক শিক্ষককে সিদ্ধান্ত নিতে হয় যে সে কি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে হত্যাকারীর নাম প্রকাশ করে দিয়ে নিজের জীবনে অনিশ্চয়তা ডেকে আনবে নাকি ব্যাপারটি বেমালুম চেপে গিয়ে নিজের ভবিষ্যৎ পথ সুগম করবে। তার কাছে এই দুটি পথই খোলা আছে। আর আছে সে পথ নির্বাচনের পূর্ণ স্বাধীনতা। অস্তিত্ববাদী দর্শনে ব্যক্তির যে স্বাধীনতা, নির্বাচন, যন্ত্রণা, নিঃসঙ্গতা ও দায়িত্বের কথা বলা হয়েছে আরেফ আলীর চরিত্রে এসব উপাদানের উপস্থিতি লক্ষ্য করার মত। কাহিনীটিকে অনুসরণ করে দেখা যেতে পারে অস্তিত্ববাদের মৌল প্রসঙ্গে যে স্বাধীনতা-সম্পৃক্ত দায়িত্ব তার প্রতি এই উপন্যাসের মূল চরিত্রের সঙ্গীবিহীন একক যাত্রার পরিণাম।

আরেফ আলী যখন প্রথমবারের মত বাঁশঝাড়ে যুবতী নারীর মৃতদেহ দেখতে পায় তখন তার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের বিক্ষুব্ধ সংগ্রাম এক ইন্দ্রিয়াতীত 'নিঃশব্দ ঘূর্ণিঝড়ের' সৃষ্টি করে। আরেফ আলীর যুবক বয়সের মন স্বপ্নালু ও সৌন্দর্যপিয়াসী। মধ্যরাতের শীতল মায়াবী জ্যোৎস্নায় আনন্দ-শরে বিদ্ধ হয়ে সম্মোহিতের মত সে ঘুরে বেড়ায়। তন্মুহূর্তে যুবতী হত্যার মত নিষ্ঠুর ভয়াবহ বাস্তব তার হৃদয়ের মর্মমূলে প্রচণ্ড আঘাত হানে। মধ্যরাতের দিকচক্রবালপ্লাবিত জ্যোৎস্না এবং হত্যাকাণ্ড—এই দুই প্রচণ্ড বিপরীতকে কিছুতেই মেলাতে পারে না সে। দিশেহারা আরেফ আলী ক্ষত-বিক্ষত চৈতন্যের চাবুকে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটোছুটি করে। তখন বাস্তবে কোথাও বাঁশী না বাজলেও অস্তিত্বের গভীরে গুহা-কন্দর পরিপূর্ণ করে তীব্র শব্দে বাঁশী বেজে চলে। আরেফ আলীর জীবনে দুঃখ দারিদ্র্য থাকলেও সদ্যযৌবনা নারীর এমন অবমাননাকর জীবনাবসান তার অভিজ্ঞতায় নেই। তাই অদেখা বাঁশীর তীব্র শব্দ আসলে ভয়ঙ্কর দৃশ্যটির প্রতি তার চৈতন্যের অস্বীকৃতি। চারদিকের অপরূপ সৌন্দর্যের মাঝখানে তরুণীর কদর্য মৃত্যু তাকে যন্ত্রণাক্ত করে। এই যন্ত্রণাই জন্ম

দেয় ভীতির। ভীতি এক পর্যায়ে তাকে ক্রন্দনমুখী করে তুললেও সে কাঁদেনা। চাপা আবেগ এবং ভীতির অনবরত চাপে সে হ্যালুসিনেশন দেখে—

> হয়ত একদল সাদা বকরী দেখে, যার সিং দাঁত চোখ কিছুই নাই। হয়ত মনে হয় রাত্রি গা মোড়ামোড়ি দিয়ে উঠে বসেছে ···ওপরে চাঁদ হেলে দোলে, হয়ত হাসেও। ···সামনে কিছু নাই, তবু দেখে লোকটি দাঁড়িয়ে ···তার মনে হয় একটি হিংস্র কুকুর তার উপর ঝাপিয়ে পড়লো বলে। তারপর সে দেখে, বাঁশ ঝাড়ের সে মৃত-দেহটি তার পথ বন্ধ করে লাঙ্গল-দেয়া মাটিতে বাঁকা হয়ে শুয়ে আছে···শীঘ্র তার পিঠ শির শির করে ওঠে। পিঠে সাপ চড়েছে যেন। ···সে বুঝতে পারে লোকটি দাঁড়িয়ে তারই পিঠের ওপর। মুখ না তুলেই দেখতে পায় তাকে : বিশালকায় দেহ, তার ছায়াও বিশালকার।[১৬]

কিন্তু একসময় ভীতি শেষ হয়। মনের সঙ্গে সঙ্গে দেহের প্রতিক্রিয়াও স্বাভাবিক হয়ে আসে। পরিষ্কার চোখে চারধারের জ্যোৎস্না-উদ্ভাসিত মাঠ ছাড়া আর কিছু দেখতে পায় না সে। তবে "দূরে একটা কুকুর বেদনার্ত কণ্ঠে আর্তনাদ করে ওঠে" (পৃ. ১২)। আসলে কুকুর নয় বিচিত্র মানসিক এবং দৈহিক অভিজ্ঞতায় তারই ব্যাথিত হৃদয়ের সন্ত্রস্ত যন্ত্রণাকাতর হাহা-কার, তার অন্তর্জগতের একান্ত উপলব্ধিই এ-আর্তনাদ।

এর পর থেকেই জ্যোৎস্না রাতে দেখা অচেনা তরুণীর মৃতদেহ তাকে এক বিহ্বল আত্মিক সংকটে নিক্ষেপ করে। আইরিশ নাট্যকার শ্যামুয়েল বেকেটের নাটকের চরিত্রের মত আরেফ আলীও অতঃপর এক জগৎবিচ্ছিন্ন ব্যক্তিক শূন্যতা ও নিঃসঙ্গতাবোধে আক্রান্ত হয়। বেকেটের নায়কেরা প্রাত্যহিক জীবন থেকে ছিটকে এসে নিজের জীর্ণ গৃহকোণে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে সত্য উপলব্ধির জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এখানেও আরেফ আলী —জনবিচ্ছিন্ন আরেফ আলী শুধু নির্জন ঘরে নয় তার প্রাত্যহিক জীবনের যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের মধ্যেও সত্যের নির্দয় অঙ্গুলি সংকেতে তাড়িত হয়। মনস্তত্ত্ববিদরা মনের প্রচণ্ড চাপ কমাবার জন্য আত্মজনকে যন্ত্রণার ভাগ দিতে পরামর্শ দেন। কিন্তু আরেফ আলীর বন্ধু নেই, প্রিয়া নেই, নিকটজন থেকেও নেই। সুতরাং সত্যপ্রকাশের বিরাট দায় তাকে একাই বহন করতে হয়। সেজন্যই—

সজোরে নিঃশ্বাস নিয়ে যুবক শিক্ষক তারপর জানালা দিয়ে স্বর্ণোজ্জ্বল সূর্যালোকের দিকে তাকায় কিন্তু সে আলো সে দেখতে পায়না। একটি দৃশ্যই কেবল তার চোখে ভাসে। সে দৃশ্য থেকে তার নিস্তার নাই, তার মনে-প্রাণে ও দেহের রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার বিভীষিকাময় ছায়া।[১৭]

এই বিভীষিকা পশ্চাতে থেকে তার দৈনন্দিন জীবন বিশৃঙ্খল করে দেয়। ফলে তার অন্তর্জগত আর বাস্তব জগতের মধ্যে অস্বাভাবিক দূরত্বের সৃষ্টি হয়। নিজের সঙ্গে নিজের এক ক্লান্তিহীন নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামে লিপ্ত হয় সে। ক্লাসরুমের মত প্রত্যক্ষ বাস্তবতার সেই দৃশ্য দেখে তার "নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, শরীরেও কাঁপুনি ধরে" (পৃ. ৪২)। ছাত্রকে পড়া জিজ্ঞেস করে উত্তর শোনার ভান করতে হয় তাকে। তার এই পরিবর্তন এমনকি বালক ছাত্রদেরও চোখ এড়ায়না। দেহ মনের এই স্খলিত ত্রস্ত অবস্থাকে আয়ত্তে আনার জন্য আরেফ আলী অবশেষে নিজেই নিজেকে শান্ত্বনা দেয় যে গতরাতে দেখা দৃশ্যটির সঙ্গে তার কোন ব্যক্তিগত যোগাযোগ নেই। দৃশ্যটির সঙ্গে জড়িত পাপ-নৃশংসতা কোনদিন তাকে স্পর্শ করবেনা। কিন্তু আসলে কি সে জড়িত নয়? আরেফ আলী বিশ্বাস করে যে মানুষের "জীবন সবচেয়ে মূল্যবান জিনিস মানুষের সহানুভূতি, সহৃদয়তা স্নেহামমতা" (পৃ. ৯৪)। এবং এ সব কি শুধুই জীবিত মানুষের জন্য? মৃতের কি এখানে কোন অধিকার নেই? আরেফ আলী নিশ্চিত যে মৃতেরও জীবিতের মত শাসন পাবার অধিকার আছে, সহানুভূতির অধিকার আছে। সে জন্যই সে সত্য-আবিষ্কার ও সত্য-প্রকাশের দুরন্ত তাড়নায় প্রতিমুহূর্তে ক্ষতবিক্ষত হয়। মনের এই অবরুদ্ধ যন্ত্রণার চাপ থেকে মুক্তির জন্য সে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে কাদের এই হত্যার সঙ্গে জড়িত নয়। এটি তার মনের এক যুক্তিহীন বিশ্বাস হলেও এতে তার মনের স্বস্তি ফিরে আসে। এ স্বস্তি তার মনে বিশ্বাস-অবিশ্বাস, বাস্তব-অবাস্তবের মধ্যকার দোলাচলতা। বাস্তব জগতে ঘা খেয়ে তাকে সরাসরি অস্বীকারের মধ্য দিয়েই প্রত্যাহিক জীবনের ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে এই যুক্তিহীন স্বস্তির আশ্রয় নিতে হয়।

কিন্তু এ স্বস্তির স্থায়িত্ব ভঙ্গুর। পরের রাতেই কাদের তাকে জানায় জন্তু-জানোয়ারের হাত থেকে তরুণীর মৃতদেহটি সে সরিয়ে ফেলতে চায়। এ আহ্বানের অর্থ না বুঝেই আরেফ আলী তাকে যন্ত্রের মত অনুসরণ করে

যা তার বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়না যা বিশ্বাস করলে যন্ত্রণার নিরন্ধ্র অন্ধকারে নিক্ষিপ্ত হতে হয় সেই বাস্তব জগতে আবারো কাদেরের ইঙ্গিতে প্রবেশ করে সে। কিন্তু এজন্য তার কোন বেদনা হয় না। বরং এক ধরনের উত্তেজনা বোধ করে। অভিসারের উত্তেজনা। বাস্তব-অবাস্তবের নাগরদোলায় বিশ্বাস-অবিশ্বাসের আনাগোনায় কাদেরের সঙ্গে থেকেও এক অদ্ভূত নিঃসঙ্গতায় ভোগে সে। বাস্তব জগতে তার এই যাত্রার পরিনাম জেনে তার হৃদয় ভীত হয়। পুরোনো জীবনকে টেনে ধরে তাতে আশ্রয় নিয়ে এই ভীতি থেকে পরিত্রাণ পেতে চায় সে প্রাণপনে। আমেরিকার নাট্যকার টেনেসি উইলিয়মসের দ্যগ্রাস মেনেজারি-র চরিত্রদের মত বাস্তবের আঘাত থেকে আরেফ ফিরে যায় অতীতের জগতে। অবশ্য স্বল্প সময়ের জন্য। আরেফ আলী জানে এ যাত্রাতেই তার ভবিষ্যৎ জীবন নির্ণীত হতে যাচ্ছে। এ মুহূর্তে সবকিছুকে অস্বীকার করে যদি সে ঘরে ফিরে যায় তাহলে জীবনের অর্থ হবে এক রকম আর এ যাত্রা শেষে জীবন হবে ভিন্নার্থক। তার মনে হয় পৃথিবীতে যা কিছু ঘটে তা সকল মানুষ দেখেনা আর তাই বিশাল গহ্বরের পাশে বাস করেও মানুষ স্বস্তিতে জীবন যাপন করতে পারে। কিন্তু আরেফ আলী তাদের মত নয়। কিছু না বুঝে কিছু না দেখে কিছু বিশ্বাস না করেও কাদেরকে সাহায্য করে সে। অথচ এর পরেই তার মনে হয় সামনেই তার বিশাল গহ্বর। মনে হয় এক্ষুনি সে তাতে হুমড়ি খেয়ে পড়বে। কাদেরের সহযোগিতায় কৃত ঐ কাজটিতে নিজের কোন সংযুক্তি নেই একথা জেনেও বার বার কাদা দিয়ে ঘসে ঘসে নদীর নর্মল পানিতে হাত দুটো ধোয় সে। বুকের ভেতর শূন্যতার হাহাকার বন্দী পাখীর মত পাখা ঝাপটায়।

সেই অদ্ভূত দৃশ্য এবং কাদেরের সহযোগিতায় প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা ফল্গুধারার মত তার অন্তরে নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহিত হয়। সঙ্গে সামঞ্জস্যহীনভাবে চলে তার বাস্তব জীবনের নিত্যকর্ম। তবে এখন তাতে প্রাধান্য পায় সেই বিশেষ দৃশ্যটি। বার বার তাকে কাটা-ছেঁড়া করে, চুল-চেরা বিচার বিশ্লেষণ করে, আত্মঘাতী যুক্তিতর্কের সাহায্যে পুরো ঘটনার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হয়েও একসময় তার ধারণা জন্মে যে সমস্ত ব্যাপারটাই একটি অলীক কল্পনামাত্র। কিন্তু কল্পনার উপসংহার তার মনে দ্বিধার জন্ম দেয়" উপসংহারটি হল মানুষের জীবনের প্রতি মানুষের নির্দয় নিষ্ঠুর

উদাসীনতা (পৃ. ৮৮)। সমাজজীবনের সংঘবদ্ধ ধারার প্রথম শর্তই হোল পারস্পরিক সাহনুভূতি মমত্ব আর দায়িত্ব। এ থেকে বিচ্যুত মানুষের সামনে অবশিষ্ট থাকে দূরতিক্রম্য নৈরাশ্য। আশাহীন মানুষ পূর্ণতা বিচ্যুত খণ্ড মানুষ এবং 'without hope there is no life.'[১৮] তাই মানুষের প্রতি মানুষের উদাসীনতা, নিষ্ঠুরতার বিষয়টি আরেফ আলীকে ভাবিত করে তোলে। মৃত্যুর 'নৃশংসতা নয়, মনুষ্যত্বহীন ভয়াবহ" (পৃ. ৭৯) এক সমাজপরিবেশের চিন্তায় তার মন বিপর্যস্ত হয়। কিন্তু এই বাস্তব জান্তব সত্য পরিবেশ থেকে আবারো নিজের বিশ্বাসকে উন্মুখ করে অন্যত্র স্থাপন করে সে। নতুন করে বিশ্বাস করতে শুরু করে যে স্বপ্নের জগতে এমনটি হলেও বাস্তব পৃথিবীতে মানুষ মানুষের প্রতি এমন নির্দয়ভাবে উদাসীন নয়। এই নতুন বিশ্বাসের সূত্রে আবারো স্বস্তি লাভ করে সে। এভাবে অজ্ঞানতার মোহান্ধকারে ডুব দিয়ে নিজেকে কদর্য সত্যের করাল থাবা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। শীতল জ্যোৎস্নার দিগন্ত বিস্তারী ধারা-স্রোতে ভেসে যেতে যেতে চাঁদের বিকৃত মুখের স্মৃতি বড় ভয়ঙ্কর। সমগ্র মানুষের জন্য তাই আরেফ আলী একটি নিঃশব্দ প্রার্থনাও উচচারণ করে: প্রত্যক্ষ বাস্তবের রূপ নিষ্ঠুর রুক্ষতা যেন সৌন্দর্যকামী মানুষের বহতা জীবন-স্রোতে প্রবল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না করে। মানুষের প্রতি ভালোবাসার আবেগে চোখ তার অশ্রুসজল হয়ে ওঠে।

তৃতীয় রাতে আবার কাদেরের মুখোমুখি দাঁড়ায় সে। কাদের নয় যেন কঠিন ও কলুষতাময় সত্য তার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। তার সঙ্গে গত কয়েক-দিনের বিভীষিকাময় অবাস্তব জগৎটিও তাকে চারপাশ থেকে ব্যূহের মত ঘিরে ধরে। তখন সত্য থেকে পালাতে চায় যুবক শিক্ষক। কিন্তু কোথায়? প্রথমাবধি সে জানত সত্যের স্বরূপ——

> যুবক শিক্ষক সবই বোঝে প্রথম থেকেই সে সব কথা বুঝেছিল, কিন্তু মন স্বীকার করতে চায় নাই। ঘটনার নৈকট্যে তা না বুঝে উপায় ছিল না। কিন্তু কিছু সময় পেরিয়ে গেলে কথাটা মন আর মানতে চায় নাই। তারপর থেকে সে সত্যকে এড়াবার জন্য বাঁদরের মত কল্পনার গাছের এক শাখা থেকে অন্য শাখায় ঝুলে ঝুলে বেড়াচ্ছে। সত্যটি গ্রহণ করা কি এত সহজ? একবার গ্রহণ করলে চিরকালের জন্য জীবনে একটা ফাটল ধরবে না? তার-পর কি পৃথিবী সে-ই পৃথিবীই থাকবে?[১৯]

সুস্থভাবে বেঁচে থাকার প্রয়োজনে সে অবাস্তব জগৎ, যে সত্য-চ্যুত বিশ্বাস সে ধীরে ধীরে গড়ে তুলেছে তা থেকে পতিত হওয়া মর্মান্তিক। কিন্তু সত্য নির্মম। সত্য অপরিণামদর্শী। নিজেকে অকস্মাৎ প্রখর দিবালোকের মত প্রকাশ করে সত্য। তাতে যদি মানুষের কষ্টে গড়া স্বস্তির জগৎ গুঁড়িয়ে ধূলো হয়ে যায় সে ফিরে তাকায় না। নিজেকে প্রতারণা করে যে বিশ্বাস তিলে তিলে নিজের মনোমত করে গড়ে তুলেছিল আরেফ আলী, পূর্ণ সত্যের করাল থাবার নীচে আজ তাকে নিশাচরের মত ভয়ঙ্কর মনে হয়। তীব্র আঘাতে নবজন্ম হয় যুবক শিক্ষকের। তিক্ততার অবসানে দাউ দাউ জ্বলে ওঠে সত্যের দহন। আত্মমুক্তি ঘটে তার, "শীর্ণদেহ যুবক শিক্ষক আগুনের লেলিহান শিখায় যেন দীর্ঘকায় হয়ে ওঠে, তার রক্তহীন শুষ্ক মুখ যেন অত্যুজ্জ্বল রূপ ধারণ করেছে (পৃ. ১০১)।

স্বল্পশিক্ষিত দরিদ্র পরনির্ভর ম্রিয়মাণ এবং দুর্বলচিত্ত যুবকটি অচেনা এক মানুষের অবমাননায় নিজের বিশ্বাস-ভঙ্গের বেদনায় রূপান্তরিত হয় পূর্ণ মানুষে। আত্ম-অহংকার ও আত্মসম্মানবোধ তাকে যথার্থ অস্তিত্ববান মানুষে পরিণত করে। "Man is a man becouse he he acknowledges the dignity in hemself."[২০] সে যে "তুচ্ছ কীটপতঙ্গ" নয় হত্যাকারীর হাতে ব্যবহৃত হবার মত একটি যন্ত্রবিশেষ নয়—এই বোধ তাকে পূর্ণ মানুষের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করে। অতীত সে ভুলে যায় ভবিষ্যৎ সে দেখতে পায়না। এই মহূর্তে তার বাস্তব অবস্থান—Now and here এই মুহূর্তে তার নিজস্বত্ব চরমতম সত্য হয়ে ওঠে। এক সময় দরবেশ নামে পরিচিত কাদেরের সঙ্গে সখ্যতা স্থাপনের জন্য ব্যাগ্র যুবক শিক্ষক দেখে কাদের এবং তার মধ্যে এক বেদনাময় বিশাল ব্যবধান। যে মুহূর্তে কাদের নিজের অপরাধ স্বীকার করে সে মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নেয় আরেফ আলী। গোষ্ঠীসমাজের স্বার্থে অপরাপর জীবিত সহবাসীদের কল্যাণের নিমিত্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে। একজন যুক্তিবাদী দার্শনিকের মত একটির পর একটি যুক্তি দিয়ে প্রতিটি ব্যাপারের পুঙ্খানপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ করে নিজ সিদ্ধান্তের যাথার্থ্য নির্ণয় করে সে। কারণ তার ধারণায় জীবন বড় মূল্যবান। নিজের এবং পরের। সিদ্ধান্তে ভুল থাকলে অন্ততঃ একটি জীবন অর্থহীন ঝরে যাবে। সতর্ক আরেফ আলী ভেবে দেখে আশাবাহিত হয়েই জীবন নিরবধি বয়ে চলে। তাই নতুন আশার পশ্চাদ্ধাবন করে সে। কাদের যদি মেয়েটিকে

ভালোবেসে থাকে তাহলে ব্যাপারটিকে একটি দুর্ঘটনা মাত্র বলা চলে। দুঃখজনক দুর্ঘটনা হলেও তখন আর তা মনুষ্যত্ববর্জিত থাকেনা। কিন্তু এখানে আশাহত হয় আরেফ আলী। অচেনা নারীর সঙ্গে কাদেরের সম্পর্ক ছিল ইন্দ্রিয়জ কামনা বাসনার। প্রণয় নয়। আরেফ আলী জানে মানুষের ওপর বিশ্বাস হীরানো পাপ। কিন্তু তখন আরেফ আলীর আর অন্য পথে যাবার উপায় থাকে না। সমবাসী মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হয় সে। সত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়।

লক্ষ্য করার বিষয় নিতান্ত নীরিহ এই যুবকের জীবন নির্বিরোধ কেটে যাচ্ছিল। পরান্ন-পালিত মেরুদণ্ডহীন একটি কীটতুল্য মানুষ। যার অতীত অস্পষ্ট, ভবিষ্যত কুয়াশাচ্ছন্ন। সে যে একজন স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষ এ সচেতনতা তার ছিল না। জীবন সম্পর্কে ভাবার প্রয়োজন কখনো সে বোধ করেনি। তবে তার একটি বিশ্বাস ছিল। বিশ্বাসের একটি জগৎ ছিল। তার বিশ্বাস ছিল মানুষ মানুষের জন্য। এবং জীবন বড় মূল্যবান। সেই মূল্যবান জীবনকে বাঁশঝাড়ে তার ক্ষুদ্র জীবনে প্রথম বারের মত লাঞ্ছিত হতে দেখে, মানুষের প্রতি মানুষের হৃদয়হীন নিষ্ঠুরতা দেখে তার চৈতন্য জাগ্রত হতে শুরু করে। তবু নিজের বিশ্বাসের জগৎকে টিকিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করে সে। কিন্তু মৃত যুবতীর প্রতি প্রণয়হীন সম্পর্কের কারণে কাদেরকে ক্ষমা করতে পারেনা সে। আত্ম-তদন্তের জটিল তর্ক-বিতর্কে ক্ষত-বিক্ষত হয়েও সহজ সত্যকে অবাস্তব স্বপ্ন বলে বিশ্বাস করতে শুরু করে সে। কিন্তু শেষপর্যন্ত ঘটনাটিকে হত্যাকাণ্ড বিবেচনা করে হত্যাকারীকে চিহ্নিত করাই সাব্যস্ত করে যুবক শিক্ষক। অস্তিত্ববাদীরা বিশ্বাস করেন সংঘবদ্ধ সমাজজীবনে ব্যক্তি মানুষ বেঁচে থাকে মাত্র কিন্তু জীবনের কোন সংকট মুহূর্তে এসেই তার অস্তিত্বের স্বাধীনতা প্রকাশিত হয়। প্রতি মুহূর্তে মানুষ সংকটে পড়েনা কিন্তু সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ব্যক্তি মানুষ নিজের অস্তিত্ব উপলব্ধি করে। কারণ সংকট-উত্তরণের জন্য তাকে একাকী কর্মপন্থা বাছাই করতে হয়, একাকীই সিদ্ধান্ত নিতে হয়। অস্তিত্ববান মানুষ লক্ষ্য রাখে যেন তার গৃহীত সিদ্ধান্ত সকল মানুষের কল্যাণের পক্ষে হয়। আরেফ আলীও হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিয়ে সমাজের কল্যাণ করাতে চায়। সমাজের প্রতি তার দায়িত্ব পালনের অলিখিত অঙ্গীকার পূর্ণ করতে চায়। নিজের ক্ষুদ্র জীবনকে অনিশ্চয়তায় নিক্ষেপ করে হলেও।

সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করার সিদ্ধান্ত নিতে গিয়ে আরেফ আলী এক রূপ বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়ায়। সত্য প্রকাশের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে হলে তাকে নিরাপদ আশ্রয় এবং চাকুরিটি হারাতে হবে। চাকুরিটির সঙ্গে তার বিধবা মা এবং ছোট ভাইবোনদের বেঁচে থাকার প্রশ্ন জড়িত। এখানেই তার চরমতম পরীক্ষা। সে কি পরিবারের প্রতি দায়িত্ব পালন করবে নাকি হত্যাকারীকে ধরিয়ে দিয়ে স্বাধীন অস্তিত্ববান ব্যক্তি মানুষ হিসেবে সমাজের অন্য মানুষের প্রতি তার দায়িত্ব সম্পাদন করবে ? দুটোর যে কোন একটা দায়িত্ব বেছে নিতে পারে সে। সার্ত্রের ছাত্রটিও এমনি এক সমস্যায় পড়েছিল।[২১] দেশ সেবা নাকি মায়ের প্রতি কর্তব্য ? দুইয়ের মধ্যে নির্বাচন করতে না পেরে সে শিক্ষকের কাছে গিয়েছিল সমাধানের জন্য। কিন্তু সার্ত্রে নিজেও তাকে সমাধান দিতে পারেননি। কিন্তু তাকে বলেছিলেন— you are fee, therfore choose—। কিন্তু যুবক শিক্ষক কোথাও যেতে পারেনি। হতদরিদ্র বাংলাদেশের ততোধিক দরিদ্র এই যুবকের জীবনে সার্ত্রের ছাত্রটির মত দেশসেবার মহান কর্তব্যের আহ্বান না এনেও সমবাসী মানুষের প্রতি, সমাজের প্রতি দায়িত্বের ডাক আসে। সিদ্ধান্ত নেবার সময় যুবক শিক্ষকের সেই মায়ের কথা মনে পড়েছিল কি ? কোপন নদীর ধারের ক্ষুদ্র চাঁদপারা গ্রামের দুঃখনী মা, অপোগণ্ড দুটি ভাইবোন ? সেখানে 'হাতের তালুর মত একটুকরো জমি'তে তিনটি প্রাণীর গ্রাসাচ্ছাদন হয়না, এ তো তার জানাই আছে। তাই দুটি দায়িত্বের একটি নির্বাচনের সময় যুবক শিক্ষককে কি সার্ত্রে কথিত Anguish-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়নি ? এ ব্যাপারে সাহায্য নেবার জন্য চারিদিকে কাউকে না পেয়ে তার মধ্যে কি নিঃসঙ্গতা পরিত্যক্ততার বোধ জন্মেনি ? তার জীবনের সর্বকঠিন সংকটে নির্বাচনের স্বাধীনতা তাকে এক আত্মবিশ্লেষণের অবরুদ্ধ যন্ত্রণায় নিক্ষেপ করেছিল। কারণ নির্বচনের স্বাধীনতা যন্ত্রণার অনুষঙ্গে উপলব্ধ হয়।

> When we recognize our own freedom we must experience anguish.[২২]

এখানে আরেফ আলীর নির্বাচনের স্বাধীনতা দ্বিবিধ। এক—সে ইচ্ছে করলে হত্যাকাণ্ডের ঘটনাটিকে চেপে যেতে পারে। দুই—হত্যাকাণ্ডটি সে দাদাসাহেব সহ যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে প্রকাশ করে দিতে পারে।

আরেফ আলী যদি প্রথম নির্বাচনটি করে তবে ব্যক্তিগতভাবে সে লাভবান হয়। কারণ ঘটনাটির কোন সাক্ষী নেই। প্রকাশ না করলে তার আজীবনের আশ্রয়সহ মায়ের প্রতি কর্তব্য পালন অব্যাহত থাকবে। দ্বিতীয় নির্বাচনের ফলে সে সবকিছু হারাবে। হত্যাকাণ্ডটি প্রমাণিত হলে দরবেশ হিসেবে পরিচিত কাদেরের প্রাণদণ্ড হবে। যথার্থভাবে প্রমাণ করাতে না পারলে ব্যাপারটি বুমেরাং হয়ে তার নিজেরই প্রাণসংশয় ঘটাতে পারে। এ বড় কঠিন সংকট। সার্ত্রের বক্তৃতা থেকে জানা যায় যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে একজন জেনারেল যখন আক্রমণের আদেশ দেন তখন অনেক মানুষের মৃত্যুর দায়িত্ব কাঁধে নিয়েই দেন। কঠোর কর্তব্য পালনের জন্য আদেশ দিতে গিয়ে সব জেনারেলকেই এক অনতিক্রম্য Anguish-এর মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়। এক্ষেত্রে যুবক শিক্ষক নিজের পরিবার, সহকর্মী, অভিভাবক তুল্য দাদাসাহেব কারুর সাহায্য ছাড়া একাকীই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। মায়ের প্রতি কর্তব্যের চেয়েও অচেনা এবং মৃত যুবতীর প্রতি কর্তব্য, জীবিত মানুষের প্রতি তার সমাজের প্রতি কর্তব্যই তার কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। মানুষের জন্মের ওপর তার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই—

> We are born in a certain place at a certain time with certain characteristics which are not of our choosing and we are comitted to living as we do by all these factors, which are built into us and are beyond your control.[২৩]

জন্মের ব্যাপারে স্বাধীনতা না থাকলেও কর্মের ব্যাপারে মানুষ স্বাধীন। তাই দুটি দায়িত্বের মধ্যে যেটি তার কাছে অধিকতর প্রয়োজনীয় মনে হয়, প্রচণ্ডতর মনে হয় তার পক্ষেই সিদ্ধান্ত নেয় সে। মানুষের প্রতি মহৎ কর্তব্যের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেকে দায়িত্ববান স্বতন্ত্র ব্যক্তি মানুষ হিসেবে আবিষ্কার করে আরেফ আলী। কাদের একসময় তাকে মেরুদণ্ডহীন কীটপতঙ্গ বিশেষ বলে মনে করলেও এই সিদ্ধান্ত নেবার স্বাধীনতা তাকে হৃত-আত্মসন্ধান সগৌরবে পুনরুদ্ধার করে দেয়। দাদাসাহেবের প্রবল প্রতাপান্বিত ব্যক্তিত্বের আচ্ছন্নতা কাটিয়ে মাথা উঁচু করে মেরুদণ্ড খাড়া করে একজন পূর্ণ মানুষ হিসেবে উঠে দাঁড়ায় সে। মনে রাখা দরকার যে মানুষের প্রতি এই দায়িত্ব কেউ তাকে অর্পণ করেনি। এ দায়িত্ব স্বাভাবিক

সহজাত জন্মগত। এ অনুভব স্বভাবজ। পারস্পরিক এই সুদৃঢ় কর্তব্য-বন্ধনই সমাজগঠনের অন্যতম শর্ত। উপন্যাসটিতে স্থানের নামোল্লেখ নেই দেখে সমালোচক একে "সর্বস্থানের সর্বকালের এবং সার্বজীন"[২৪] বলে মন্তব্য করেছেন। আসলে সমবাসী মানুষের প্রতি ব্যক্তিমানুষ আরেফ আলীর দায়িত্ববোধ উপন্যাসটিকে সর্বকালের অস্তিত্ববান পূর্ণ মানুষের কাহিনীতে পরিণত করেছে। মানুষের প্রতি দায়িত্ব দুর্বল ভীতু সৌন্দর্যপ্রিয় আরেফ আলীকে চৈতন্য-আবর্তনের স্তরের পর স্তর অতিক্রম করিয়ে শেষে একটি স্বাধীন পূর্ণাংঙ্গ ব্যক্তিসত্তায় রূপান্তরিত করেছে।

সার্ত্রের 'নসিয়া' উপন্যাসের নায়ক আতোয়াঁ রোক্যুতাঁ নিজের চার-পাশের বিকৃত বিশৃঙ্খল জগতে সঙ্গতি এবং ছন্দ খুঁজে না পেয়ে নিজের অস্তিত্বের প্রতিই হতাশাগ্রস্ত ও বিরক্ত হয়ে পড়েছিল। ফরাসী লেখক ক্যমুর 'মিথ অব সিসিফাসে' মানবজীবনের যে ব্যর্থতা ও অর্থহীনতার কথা বলা হয়েছে রোক্যুতাঁর কাছেও তেমনি জীবন অর্থহীন রিক্ত বলে মনে হয়েছে, এই নারকীয় গ্লানিবোধ থেকে উদ্ধারের প্রথম ইঙ্গিত সে দেখেছিল এক নিগ্রো মহিলার সুরনির্ঝরে। তার মনে হয়েছে শিল্পের জগতে নিজেকে প্রকাশের মধ্যেই তার আত্মমুক্তির সম্ভাবনা। তাই নিরাশা-পরাস্ত আতোয়াঁ তার বিপন্ন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য শিল্প-সাহিত্যের সৃজন-কর্মযজ্ঞের জগতে আশ্রয় নিয়ে নিজেকে ফিরে পেতে চেয়েছে। আর এখানে আরেফ আলীর অস্তিত্বের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সত্যের প্রসন্ন আলোকচ্ছটায়। চৈতন্যের গভীরে নিজের সঙ্গে নিজের যুক্তিতর্ক আর বাস্তব থেকে স্বক-ল্পিত অবাস্তব জগতে ক্রমাগত আসা যাওয়ায় ক্লান্ত অবসন্ন আরেফ আলী শেষ পর্যন্ত সত্যের সন্ধান পেয়ে তার স্বাধীন অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে। হেমিংওয়ের 'দ্য ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সি'-র নায়ক সান্টিয়াগোর নিঃশব্দ লড়াই ছিল বৈরী সমুদ্র প্রতিবেশের সঙ্গে। তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের অন্তহীন দীর্ঘ পথ আর অগণিত হিংস্র ভয়াল হাঙ্গরের সঙ্গে। নিজের অস্তিত্বে আস্থাবান এই মানুষটি গৃহীত সিদ্ধান্তের সপক্ষে, নির্বাচনের সপক্ষে বীর যোদ্ধার মত শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সংগ্রাম করে গেছে। তবে তার লড়াই যাদের সঙ্গে তাদের চোখে দেখা যায়। 'মেঘনাদবধের' রাবণের লড়াই ছিল খানিকটা দৃশ্যমান রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে খানিকটা অদৃশ্য দৈব-শক্তির সঙ্গে। আর এখানে আরেফ আলীর লড়াই—গ্রন্থের প্রথম

থেকে শেষ পর্যন্ত—নিজেরই আত্মসত্তার সঙ্গে। নিজেরই মনগড়া বাস্তব-অবাস্তবের সঙ্গে, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের সঙ্গে। এদের কাউকেই চোখে দেখা যায়না। পুঙ্খানুপুঙ্খ আত্ম-তদন্তের মধ্য দিয়ে নিজের চৈতন্যকে বারংবার মথিত মর্দিত করে শেষ পর্যন্ত সত্যের প্রসন্ন আলোয় আত্মমুক্তির পথসন্ধান পায় সে। জীবনের চরম সংকটে একজন অস্তিত্ববান মানুষের মতই স্বাধীন কর্মপন্থা নির্বাচনের মধ্য দিয়ে নিজের যথার্থ স্বরূপ উপলব্ধি করে সমাজের প্রতি সমরাসী অন্যান্য মানুষের প্রতি দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে নবজন্ম হয় তার।

তথ্যনির্দেশ

১ দ্রষ্টব্য, ১২-২-৮২ তারিখের রোববারের দৈনিক বাংলা।

২ নূরউল করিম খসরু, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর ছোটগল্প : বিষয়-আশয়, প্রথম প্রকাশ ১৯৮৩, পৃ. ১২

৩ সৈয়দ আবুল মকসুদ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র জীবন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ ১৯৮১, পৃ. ১১৭

৪ শরীফ হারুণ, জ্যাঁ-পল সার্ত এবং অস্তিত্ববাদ, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮০, পৃ. ৯

৫ সৈয়দ আবুল মকসুদ, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১১৭

৬ Jean-Paul Sartre, Existentialism & Humanism, Translation & Introduction by Philip Mairet. Eyre Methuen L'd, London. P. 28

৭ Mary Wornock, the Philosophy of Sartre, Reprinted 1966-71, P. 53—54

৮ Paul Tillitch, The courage to be collins, march—1977.

৯ Jean-Paul Sartre, Nausea, Penguin Books Ltd. 1973. P. 132—23

১০ মৃণালকান্তি ভদ্র, অস্তিত্ববাদ : জ্যাঁ-পল সার্ত্রের দর্শন ও সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৮।

১১ Sartre, Existentialism & Humanism. Ibid. P. 34

১২ G. S. Fraser, The mordern writer & his world, Pelican books—1964, P. 18

১৩ H. J. Blackham, six E-xistentialist thinkers, Routledge & Kegan Poul Ltd.—1961. P. 137

১৪ Mary warnock, Ibid. P. 9

১৫ সৈয়দ আবুল মকসুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

১৬ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, চাঁদের অমাবস্যা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৭২ পৃ. ১০-১১

১৭ ঐ, পৃ. ৪২

১৮ Karl Japspers, philosophy for everymau Hulchinson of London—1969, P. 39

১৯ সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ, পূর্বোক্ত পৃ, ৯৯-১০০

২০ Karl Jaspers, Ibid, P. 39

২১ Jean-Paul-Sartre, Ibid, P. 35-36

২২ Mary warnock, Ibid. P. 110

২৩ Ibid, P. 110-111

২৪ সৈয়দ আবুল মকসুদ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯